সনেট, মহাকাব্য, ক্রমবর্ধমান উত্তরাধুনিক ভাবধারা ও কবিতার বিচিত্রতা নির্মাণে তিনি জীবনের বহুবিধ দিক স্পর্শ করেছেন। বাংলা কবিতাকে নিয়ে গেছেন মাতৃভূমির মানচিত্রের বাইরে। অনুবাদের মাধ্যমে নানা দেশে সমাদৃত এই কবিকে ইয়োরোপ দিয়েছে হোমার পুরস্কার। মার্কিন অধ্যাপক নিকোলাস বার্ন্স লিখেছেন, "তিনি শুধু সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন, তাঁর প্রজন্মের প্রধানতম কবি।" শহীদ কাদরী মন্তব্য করেছেন, "হাসানআল আব্দুল্লাহ নব্বই দশকের অন্যতম প্রধান কবি।" আর পশ্চিম বঙ্গের কবি-সমালোচক জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁকে "বাংলার ভূমিজ এক নতুন শক্তি," বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রীক কবি মারিয়া মিস্ট্রিয়টির ভাষায় তাঁর কবিতা "দর্শনাশ্রয়ী, অসংখ্য প্রতীকে পরিপূর্ণ।"

কবিতার মতো গদ্যেও যে নতুন সৌন্দর্য নির্মাণ করা যায় এই ভাবনায় বিশ্বাসি হয়ে তিনি লিখেছেন গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনি। তাঁর প্রকাশিত সাতটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে এই বইয়ের রচনাগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কবিতা, কবিতার ছন্দ, কাব্যসমালোচনা, নারীর অগ্রযাত্রা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, এবং ব্যক্তি ও সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি ইতিমধ্যে সমাদৃত হয়েছে। এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমি প্রবন্ধ লিখেছি নিজেকে বিকশিত করতে, যে বিষয়ে লিখেছি সেই বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে। তবে, ভাষার সাথে কখনো আপোষ করিনি। এই ব্যাপারে যেসব লেখককে অনুসরণযোগ্য মনে করেছি তাঁরা হলেন শিবনারায়ণ রায়, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ।" বাংলা ভাষার প্রধানতম এই প্রাবন্ধিকদের মতোই হাসানআল আব্দুল্লাহর প্রবন্ধও পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

হাসানআল আব্দুল্লাহ

নির্বাচিত প্রবন্ধ

নালন্দা

উৎসর্গ

যারা সৎ, সাহসী এবং সৃষ্টিশীল

ভূমিকা

আমার প্রথম প্রবন্ধ 'কবিতার কথা: তিন প্রকার ছন্দ'। এটি আমি লিখেছিলাম বন্ধুদের অনুরোধে সহজ ভাবে ছন্দ বিশ্লেষণ করতে। পরে এই বিষয়ে আরো কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ পেলে 'কবিতার ছন্দ' নামে একটি পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমিতে জমা দেই ১৯৯৫ সালে। অনুমোদিত হয়ে বই আকারে প্রকাশ পায় ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে। সেই থেকে গ্রন্থখানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই বইয়ের জন্যে পাঠক বা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত চিঠি ও অধ্যাপকদের নানা মন্তব্য আমাকে বরাবরই উৎসাহিত করেছে। ফলত, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা অব্যাহত রেখেছি। প্রকাশিত আরো কিছু রচনা থেকে বাছাই করে প্রকাশ করেছি 'কবিতার জন্মদাগ' নামে আরেকটি গ্রন্থ। এরপর একে একে বেরিয়েছে 'নারী ও কবিতার কাছাকাছি', 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা' এবং 'কবিতার স্বদেশ বিদেশ'; তাছাড়া শহীদ কাদরী ও হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে লেখা জীবনীধর্মী গ্রন্থ যথাক্রমে 'সময়ের সম্পন্ন স্বর' ও 'রক্তাক্ত কবির মুখ' যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। দেশ বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেয়েছে আমার প্রবন্ধগুলি। লিটলম্যাগ ও দৈনিকের সম্পাদকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েও বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছি। নিজের পঠন-পাঠনকে সমৃদ্ধ করতে এইসব প্রবন্ধ নানাভাবে আমার উপকার করেছে। তবে দু'একটি লেখা যে বিপদে ফেলেনি তা নয়। যেমন 'ক্লাসিক্যাল এথেন্সের নারী ও তার বিপর্যস্ত ধারাবাহিকতা'! মূলত, হান্টার কলেজে পড়াকালীন গ্রীক সোসাইটি ক্লাসের জন্যে লেখা আমার ইংরেজি প্রবন্ধেরই এটি বাংলা সংস্করণ। একাধিক সম্পাদক আগ্রহ ভরে নিয়ে গালমন্দ করে ফেরত দিয়েছেন। অবশেষে, অভিজিৎ রায় সম্পাদিত 'স্বতন্ত্র ভাবনা' গ্রন্থে গুরুত্বসহকারে স্থান পেয়েছে। শিবনারায়ণ রায়ের 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে 'উত্তরাধুনিক কবিতা: প্রচ্ছদে দুই বাংলা'। শিব রায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই লেখার প্রশংসা করে বলেছেন, "কবিতার ক্ষেত্রে উত্তরাধুনিকতা কল্পনার নতুন দরজা খুলে দিতেও পারে। হাসানআল যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় এদের লেখকরা নতুন শব্দচিত্র, নতুন বাক্য বিন্যাসের চেষ্টা করেছেন। হয়তো বাংলা কবিতায় এঁরা

একটা নতুন পর্ব রচনা করবেন। বিগত ছয় দশক ধরে দুই বাংলার কবিদের ওপরে জীবনানন্দ যে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করেছেন, এঁরা মনে হয় তা থেকে অনেকটাই মুক্ত।"

অন্যদিকে 'জীবনানন্দের রঙতুলি' প্রবন্ধের অর্ধেক সরাসরি কপি করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন ঢাকার জনৈক সম্পাদক তার সংকলিত জীবনানন্দ দাশের 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমগ্র' নামে একটি গ্রন্থে। প্রতিবাদ করার সুযোগ পাইনি, কারণ "ঢাকায় এসবের প্রতিবাদ করে কিছু হয় না" বলে জানিয়েছেন আমারই এক প্রকাশক।

যাহোক, আমি প্রবন্ধ লিখেছি নিজেকে বিকশিত করতে, যে বিষয়ে লিখেছি সেই বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে। তবে, ভাষার সাথে কখনো আপোষ করিনি। এই ব্যাপারে যেসব লেখককে অনুসরণ যোগ্য মনে করেছি তাঁরা হলেন শিবনারায়ণ রায়, আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ। গত দিন দশকে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের বইগুলি থেকে বাছাই করে এখানে ৩৪টি রচনা সঙ্কলিত হলো। এর মধ্যে টি এস এলিয়টের একটি প্রবন্ধ 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিপ্রতিভা' অনূদিত আকারে রয়েছে। এলিয়ট বিশশতকের বিশ্ব কবিতায় একটি বিশাল প্রভাব রেখে গেছেন। তাঁর এই প্রবন্ধটিও কাব্যকলার এমন সব দিক তুলে এনেছে যা প্রত্যেক কবি ও শিক্ষার্থীর ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই এই সংযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি।

'নির্বাচিত প্রবন্ধ' গ্রন্থটিকে সাতটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে: কাব্যকলা, ছন্দ বিষয়ক, কবিতা ও জীবন, নারী, ব্যক্তি সমাজ ও অন্যান্য, মুক্তিযুদ্ধ ও বইয়ের কথা। যারা বিষয় ধরে বইটি পড়তে চাইবেন এই বিভাজন তাদের উপকারে আসবে বলে মনে করি।

এই বইয়ের সম্মানিত প্রকাশক, নালন্দা'র স্বত্বাধিকারী জনাব রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই নানা সময়ে আমাকে চিঠি লিখে বা নানান মন্তব্য করে যেসব বন্ধু উৎসাহিত করেছেন তাদের সবাইকে।

ধন্যবাদান্তে,

হাসানআল আব্দুল্লাহ
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

সূ চি প ত্র

কাব্যকলা

কবিতার জন্মদাগ ১১
মধ্যযুগের কবিতা: একটি পর্যালোচনা ১৫
বাংলা কবিতার বিশশতক ৩১
ষাটের দশকের কবিতা ৪২
কবিতায় জাদুবাস্তবতা:
অসম্ভবের দোলাচল ৫৫
উত্তরাধুনিক কবিতা: প্রচ্ছদে দুই বাংলা ৫৮
টি এস এলিয়টের *ঐতিহ্য ও*
ব্যক্তিপ্রতিভা ৬৮
কাব্যসম্ভরণ ৭৭
আমার কাব্যচিন্তা ৮৩

ছন্দ বিষয়ক

কবিতার কথা: তিন প্রকার ছন্দ ৯১
বাংলা ছন্দের ধারাবাহিক বিকাশ ১০৯

কবিতা ও জীবন

জীবনানন্দের রঙতুলি ১৪৯
কবিদের কবি স্ট্যানলি কিউনিটজ ১৬০
শামসুর রাহমান: সমন্বিত
প্রাচুর্যের উত্তরাধিকার ১৬৮
একজন মনীষীর বিদায় ১৮৪
শহীদ কাদরীর কবিতা: পুনর্মূল্যায়ন ১৯০
হুমায়ুন আজাদ: বহুমাত্রিকতার
সাহসী স্বরূপ ১৯৬

নারী

২১৩ ক্লাসিক্যাল এথেন্সের নারী ও তার
বিপর্যস্ত ধারাবাহিকতা
২২১ সমাজ নির্মাণে নারী
২২৮ যুক্তরাষ্ট্রের নারী: ডলারে যাদের
আয় ৮০ সেন্টের কম
২৩৪ নারীমুক্তির অগ্রপথিক

ব্যক্তি সমাজ ও অন্যান্য

২৪৫ জাদুবাস্তবতার জনক মার্কেজ
২৫২ অভিনন্দন ট্রান্সট্রোমার
২৫৬ আব্রাহামের সন্তানেরা: সঙ্গীত ও কবিতায়
২৬০ নিউইয়র্ক কবিতা উৎসব
২৭১ কবিতার জন্যে গ্রীস: খণ্ডচিত্র
২৮৮ বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে
২৯১ ক্যালকুলাস, ঝুম্পা ও সার্তের শব্দগুচ্ছ
২৯৭ আমার প্রিয় লেবন স্যার

মুক্তিযুদ্ধ

৩০৫ জননী ও যোদ্ধা
৩১১ আমার বাবা
৩১৮ আমাদের স্বাধীনতা ও বাংলা কবিতা

বইয়ের কথা

৩২৭ হারিয়ে যাওয়া সময়: অর্ধশতাব্দীর
সাহিত্যবীক্ষণ
৩৩৩ প্রিয় ধ্বনির জন্যে উজ্জ্বল কান্না

কবিতার জন্মদাগ

I am not done with my changes.
—*Stanley Kunitz*

মার্কিন পোয়েট লরিয়েট (২০০০-২০০১) স্ট্যানলি কিউনিটজ তাঁর বাসায় যখন বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন পৃথিবীর সব কবিই এক পরিবারের সদস্য এবং 'কবি-ভাই' সম্বোধন করে নিজের অনূদিত রাশিয়ার কবি আনা আখমাতোভার বই উপহার দিয়েছিলেন, তখনও আমি ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম কবিতা আসলে কি। অবশ্য সৌরমণ্ডলীর তাবৎ বস্তুর সাথে আন্তরিক যোগাযোগের কথা তুলে তিনি এক পর্যায়ে এর একটি সদুত্তর বাতলে দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরই কবিতায় পড়ি, *আই এ্যাম নট ডান উইথ মাই চেঞ্জেস*, তখন পঁচানব্বই বছর বয়সের এই তরুণের ব্যাখ্যার সাথে তাঁর লেখার স্পষ্ট মিল ধরতে না পেরে নিজের বিশ্বাসেই ফিরে আসি—কবিতাকে আসলে কোনো সংজ্ঞায়ই বাঁধা যায় না। ভাবায়, ভাবতে শেখায়, টেনে নিয়ে যায় বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি। জ্বালায়, জ্বলে এবং পোড়াতে পোড়াতে খাঁটি করে তোলে শরীরের প্রতিটি শাখা প্রশাখা—যে শরীর আদতে তারই। কবিতা তাই চব্বিশ ঘণ্টাই বসে থাকে মগজের ঠিক মাঝখানটিতে; যেখান থেকে বৃত্তের আনাচে-কানাচে, নাড়ি-নক্ষত্রে ইচ্ছা মতো উঁকি দেয়া যায় যখন তখন। আবার ভেঙে চুরমার করে দেয়া চলে বিশ্বাস ও ভিত্তির সব ক'টি ইট। শুকনো সুরকির দাগ তুলে হয়তো নতুন আবরণ, হয়তো একেবারে ন্যাংটো, অথবা উন্মাদ গীতির মতো উচ্চারণ করে যায়, সময়ের ব্যবধানে, এক একটি স্তর; যে খেলা নিয়মিত চলে ভাষার বাঘগুটি দিয়ে। ফলত, কবির বোধ পাকা হতে হতে পরিবর্তনের সংবিধান পালটে যেতে থাকে। শুরু ও শেষের বিন্যাস হয়ে যায় আলাদা। আলাদা হতে থাকে একটির পর একটি স্বতন্ত্র উচ্চারণ। যার কিছু কিছু নিয়মের গণ্ডির মধ্যে থাকলেও, অনিয়মই মূলত নিয়ম হয়ে যায়। ফলে শেক্সপীয়ার, বোদলেয়ার, র‍্যাবো, কিটস্, দত্ত, ঠাকুর, পাউন্ড, ইসলাম, দাশ, এলিয়ট, কিউনিটজ, নেরুদা, পাজ, ওয়ালকট, হিনি, এ্যাসবারি, রাহমান, মাহমুদ, শক্তি, কাদরী প্রমুখ হয়ে যান আলাদা আলাদা—নিজস্ব ভাষার অধিনায়ক। তবে ভাঙা ও মেলানোর এই খেলায় স্বস্তি আসে না কখনো। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কবি তাই থাকেন উন্মাদ একটি উৎকৃষ্ট কবিতার জন্যে।

২

স্বভাব কবির দিন শেষ হয়েছে গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের আগেই। নিয়মিত চর্চার বিকল্প এখন আর কল্পনা করা যা না। শুধু কবিতাই নয়, এ কথা সম্ভবত শিল্পের যে কোনো শাখার জন্যেই খাটে। বন্দে আলী মিয়ার মতো বা যাকে আমরা একদা ছন্দের যাদুকর বলে আখ্যা দিয়েছিলাম সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো লাইনের পর চাতুর্যপূর্ণ লাইন সাজালেই এখন আর কবি হওয়া চলে না। অবশ্য সময়ের তাৎক্ষণিক আয়োজনে হয়তো অনেকেই এ উপাধি পেয়ে যান অনায়াসে, কিন্তু কালের বিবর্তনে ওইসব উচ্চারণ হারিয়ে যেতে বাধ্য। এমনকি আজ রবি ঠাকুর, জীবনানন্দ বা পঞ্চাশের উল্লিখিত কবিদের মতো কবিতা লেখার সুযোগও আর নেই। সময়কে নিজের করে চিহ্নিত করতে, শব্দের নিজস্বায়নের বিকল্প নেই। ফলে একজন বিজ্ঞানীর মতো একজন কবিরও শিক্ষিত হয়ে ওঠা, পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অতিক্রান্ত সময় পরিপার্শ্ব ও সমসাময়িকদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ এবং তার থেকে নিজের একটি পথ তৈরি করে নেয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে যারা এগিয়েছেন তাদের অনেকেই শক্তিমান কবি—অনেকের পঙ্‌ক্তি নাড়া দিয়ে যায় চৈতন্যের মণিকোঠা। ফলে "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" যেমন আপন শক্তিতে দাঁড়িয়ে যায় তেমনি দাঁড়ায় "সাদা ভাত ঠিক উঠবেই ফুটে তারাপুঞ্জের মতো।" *সোনালি কাবিন*-এর উৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন থাকে না। প্রশ্ন থাকে না 'শাশ্বতী,' 'শীতরাতের প্রার্থনা,' 'স্বাধীনতা তুমি,' সহ আরো অনেক অনেক কবিতার কাব্যগুণ নিয়েও—যদিও এদের বুনন ভঙ্গি, বলার ঢঙ, শরীর বিন্যাস ও ছন্দের সুষমা যথেষ্ট আলাদা। আর আলাদা বলেই পরিপূর্ণও বটে।

অতএব কবির প্রতি মুহূর্তের কাজ পূর্ণাঙ্গ পঙ্‌ক্তি থেকে একটি পূর্ণ কবিতার দিকে এগোনো। ব্যাপারটি মোটেও সহজ নয়। এর পিছনে চলে যেতে পারে একটি জীবন। রিল্কে তাঁর এক তরুণ ভক্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন একটি কবিতার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করে থাকার কথা—একদা এই উপদেশকে চাতুর্যপূর্ণ মনে হলেও, এখন ভাবি দশ বছরের স্থলে 'সারা জীবন' বসিয়ে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। নিউটন, আলফ্রেড নোবেল, আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিন্স যেমন এক একটি সূত্রের জন্যে পরিশ্রম করেছেন জীবনের অনেকটা সময়, ঠিক তেমনটি কবির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সম্ভবত কবির কাজ তাঁদের থেকেও দূরূহ, কারণ কবির ভিত্তি শব্দ ও পারিপার্শ্বিকতার বাস্তব রূপ যা দেখা ও বোঝা গেলেও তার নিজস্ব আকার কবিকেই দিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীর ভিত্তি পূর্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য যা দেখবার বুঝবার ও নথিকৃত করবার পদ্ধতি দিয়ে সাজানো। ফলে স্বভাব নয়, স্বভাবের সংরক্ষিত ও সুসংযত রূপই কবিতার জন্যে উপযুক্ত।

৩

মাঝে মাঝে একটি তর্কও দানাকৃত হয়ে ওঠে—শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, নাকি ভাবনার খোলা দরজা দিয়ে অনুভূতির সতেজ বহিঃপ্রকাশের নিপুণতা দেখিয়ে কবিতার শরীর নির্মিত হয়? সাথে সাথে কবিদের মতামতের দাঁড়িপাল্লাও দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অন্তত মালার্মের চিন্তার কথা স্মরণ রাখলে শব্দের গাঁথুনিকেই গুরুত্ব দিতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় চিন্তাও ফেলে দেবার নয়। এবং ছন্দ উপমা অনুপ্রাস ও চিত্রকল্পের কৌশলগত দিকটিও ছেড়ে দেয়া চলে না। এডিথ সিটওয়েলের মতে, ছন্দের পাকাপোক্ত জ্ঞান না নিয়ে যারা কবিতা রচনা করতে নামেন তাদের শ্রম পণ্ডশ্রমই বটে। ওদিকে বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারটিও অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। উপযুক্ত বিষয় কবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে বলে কেউ কেউ বিজ্ঞের মাথা নাড়েন। তবে শামসুর রাহমানের মতে যে কোনো বিষয়েই একটি ভালো কবিতা রচনা সম্ভব। আদতে, রোমান্টিকতার আঁতুড় পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর বিপুল সম্ভাবনাময় আধুনিকতার বিশাল বাহু ধরে কবিতা ঝুলে পড়ার পর রাহমানের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়েও পারা যায় না। দক্ষ নভেরার হাতে যুদ্ধের ভাঙাচোরা অসংখ্য বিমানের পাখা ও অন্যান্য ফেলে দেয়া অকেজো অংশগুলো যেমন সুন্দর ভাস্কর্যে পরিণত হয়, তেমনি শক্তিশালী কবির কলমে যে কোনো ছোটোখাটো অচ্ছুত বিষয়ও সাবলীল কবিতার শারীরিক নৈপুণ্য পেয়ে যেতে পারে। তবে কথা, সুর, ও কণ্ঠ এ তিন মিলে যেমন একটি গান কালজয়ী হয়ে ওঠে তেমন শব্দ, অনুভূতি প্রকাশের নিপুণতা ও ছন্দের পরিপক্ব জ্ঞান মিলে কবিতাকে উৎকৃষ্ট করে তোলে। কিন্তু সব কিছুর উপরে শব্দকেই গুরুত্ব বেশি দেয়া ভালো। কারণ কবিকে সবসময়ই শব্দ নামক এই মহান প্রভুর দাস হয়ে কাটাতে হয়। নির্ণয় করতে হয় এর ওজন ও ঘনত্ব। সমুদ্রের তলদেশ থেকে ডুবুরি যেমন মণি মুক্তো খুঁজে আনেন, কবিকেও শব্দের ভুবনে ঢুকে উপযুক্ততার যাচাই বাছাই সেরে আস্তে আস্তে গেঁথে ওঠাতে হয় কবিতার শরীর—বিষয়, ছন্দ বা অনুভূতির যে স্তরেই তিনি থাকুন না কেনো কবিতা লেখার সময় শব্দই হয়ে ওঠে নাটের গুরু; ভাষার উৎকর্ষে এক একটি শক্তিশালী ইলেকট্রন। যেমন:

সে-দিনও তেমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে

থামিল কালের চিল চঞ্চলও গতি।
—*সুধীন্দ্রনাথ দত্ত*

অথবা

স্বাধীনতা তুমি,
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—
...
শ্রাবনে আকুল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি
পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
—*শামসুর রাহমান*

অথবা

এবং চৈতন্যে নেই অবিরাম অনিশ্চিত, অশেষ পতন
পলে পলে স্খলনের অঙ্গিকার আর অনুর্বর মহিলার
উদরের মতো আর্ত উৎকণ্ঠিত, আবর্তিত শূন্যতার ভার
নেই এই ভীড়াক্রান্ত, বিব্রত, বর্বর উর্ধ্বশ্বাস শহরের
তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার।
—*শহীদ কাদরী*

এইসব উদাহরণে শব্দের পরে উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার সুস্পষ্ট; দক্ষ শিল্পীর হাত এখানে পূর্ণতা টেনেছে। তবে উল্লিখিত অন্যান্য গুণাবলীও আছে জ্বলজ্বলে জ্যোতি চিহ্নের মতন—যদিও কখনো কখনো কবিকে একটি শব্দের পরে উপযুক্ত আরেকটি শব্দ খুঁজতে পার করে দিতে হয়েছে অনেকটা সময়, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মননের বিন্যাস ও উচ্চারণের গাঢ়তর ব্যঞ্জনা তৈরিতে বাহুল্য বর্জনের সাধনায় কবিই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক। আর কবিতা, কালের সাক্ষী।

৪

তারপরেও কথা থেকে যায়। মূলত, কিসে একটি কবিতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কবিতাকে যেমন কোনো সংজ্ঞার খাঁচায় বাঁধা যায় না, নির্মাণের কৌশলও কোনো নির্দিষ্টতার ধার ধারে না। তবে সংযোজন, বিয়োজন, অভিযোজনের পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

২০০১

থামিল কালের চিল চঞ্চলও গতি।
—*সুধীন্দ্রনাথ দত্ত*

অথবা

স্বাধীনতা তুমি,
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—
...
শ্রাবনে আকুল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি
পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
—*শামসুর রাহমান*

অথবা

এবং চৈতন্যে নেই অবিরাম অনিশ্চিত, অশেষ পতন
পলে পলে স্খলনের অঙ্গিকার আর অনুর্বর মহিলার
উদরের মতো আর্ত উৎকণ্ঠিত, আবর্তিত শূন্যতার ভার
নেই এই ভীড়াক্রান্ত, বিব্রত, বর্বর উর্ধ্বশ্বাস শহরের
তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার।
—*শহীদ কাদরী*

এইসব উদাহরণে শব্দের পরে উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার সুস্পষ্ট; দক্ষ শিল্পীর হাত এখানে পূর্ণতা টেনেছে। তবে উল্লিখিত অন্যান্য গুণাবলীও আছে জ্বলজ্বলে জ্যোতি চিহ্নের মতন—যদিও কখনো কখনো কবিকে একটি শব্দের পরে উপযুক্ত আরেকটি শব্দ খুঁজতে পার করে দিতে হয়েছে অনেকটা সময়, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মননের বিন্যাস ও উচ্চারণের গাঢ়তর ব্যঞ্জনা তৈরিতে বাহুল্য বর্জনের সাধনায় কবিই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক। আর কবিতা, কালের সাক্ষী।

৪

তারপরেও কথা থেকে যায়। মূলত, কিসে একটি কবিতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কবিতাকে যেমন কোনো সংজ্ঞার খাঁচায় বাঁধা যায় না, নির্মাণের কৌশলও কোনো নির্দিষ্টতার ধার ধারে না। তবে সংযোজন, বিয়োজন, অভিযোজনের পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

২০০১

মধ্যযুগের কবিতা: একটি পর্যালোচনা

১

মূলত ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের এই কালখণ্ডকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তখনকার সাহিত্য মানেই কবিতা; গদ্য এসেছে অনেক পরে। যা কিছু বলার, বলা হয়েছে পদ্যে; পদের পরে পদ বসিয়ে, বাংলা কবিতার আদি নিদর্শন চর্যাপদের মতো অন্ত্যমিল রেখে সাজানো হয়েছে পঙ্‌ক্তি।

চর্যাপদের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বাংলা কবিতায় যে বৃহৎ কালপর্বটি বহুবিধ সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয় তার নাম মধ্যযুগ, যার শুরুটা, অন্তত আমাদের প্রাপ্তিযোগের দিক দিয়ে, তেমন সুখকর ছিলো না। ১২০০ থেকে ১৩৫০ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই দেড়শত বছরের একটি শূন্যতা সেখানে বিরাজিত, যাকে বলি বন্ধকার যুগ, কারণ এই সময়ের সাহিত্যকর্মের কোনো লিখিত রূপ আমাদের হাতে নেই। অন্যভাবে বলা যায়, অন্তত কেউ কেউ মনেও করেন, এ সময়ে সাহিত্যকর্ম একেবারেই স্তিমিত ছিলো, যদিও কোনো কোনো পণ্ডিত এটা কিছুতেই মেনে নিতে চান না। তাদের যুক্তি, চর্যাপদের মতো এমন সমৃদ্ধ গীতিকবিতা দিয়ে যে সাহিত্যের গোড়াপত্তন তার অব্যবহিত পরে কিছুই রচিত হয়নি সেটা কোনো কাজের কথা নয়, বরং বলা যায় ওই সময়ে রচিত সাহিত্য ভাণ্ডার বাঙালি পাঠকের জন্যে অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। "...প্রাচীন বাঙ্গালা যুগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে একটি সন্ধিযুগ ছিল, যাহার কোনও নিদর্শন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)।" অন্যদিকে চর্যাপদের উন্মেষের কাল নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও চর্যাগীতির আবিষ্কারক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর রচনা কালকে সপ্তম ও অষ্টম দশকের মাঝামাঝি সময় বিবেচনা করলেও

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিদ মনে করেন চর্যাপদ লেখা হয়েছে আরো পরে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, মৈমনসিংহ গীতিকা এবং নানা ধরনের বাউল সঙ্গীত দিয়ে মধ্যযুগ পরিপূর্ণ।

চর্যাপদ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা রচিত প্রার্থনা সঙ্গীত—বলা হয়ে থাকে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে ধর্ম প্রচার করতেন—কিন্তু মধ্যযুগের কবিতার প্রধান বিষয় কৃষ্ণের লীলা, তার সম্পন্ন জীবন প্রবাহ—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার উপাখ্যান ভালবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এইপর্বে নায়ক নায়িকার সন্নিবেশ বাংলা কবিতার সীমানা বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করেছে।

২

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বলা যেতে পারে মধ্যযুগে বাংলা ভাষার সূচনা সঙ্গীত। ধারণা করা হয়, মহাকবি বড়ু চণ্ডিদাস প্রণিত এই কাব্যের রচনা কাল ১৩৫০ থেকে ১৪০০ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে। চর্যাপদকে যদিও উড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলি ইত্যাদি ভাষার আদিরূপ হিসেবে তারাও দাবী তোলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা যে বাংলা এবং আধুনিক বাংলার সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। শান্ত নদীর বহমান স্রোতের মতো এর বয়ে চলা অনেকটা চর্যাপদের রাগী ঢেউয়ের উল্টো বলেই ধরা হয়। এর ভাষা "নদীর পারে বাঁশির সুরের মতো নরম, বুক থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসের মতো কোমল (হুমায়ুন আজাদ)।" শুধু কৃষ্ণের বাঁশিই নয়, এর পরতে পরতে ওড়ে রাধার নীল শাড়ি, "মুক্তোর মতো ঝিলিক দেয় তার অশ্রু," কারণ মুখ তার প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥১॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥ধ্রু॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায়ে বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন্ দোষে॥
অঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥২॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সর্গ: বংশীখণ্ড, বড়ু চণ্ডীদাস)

বলা প্রয়োজন যে কাব্যাংশটুকু অনেকটা আধুনিক কালের কাব্যভাষার কাছাকাছি। সামান্য একটু অদল-বদল করে দিলে বা আট-ছয় এর চালের দোষ-ত্রুটি তুলে দিলে এর অবস্থান দাঁড়ায়:

কে বাঁশি বাজায় ওই যমুনার কূলে।
কে বাঁশি বাজায় শুনি এ গ্রাম গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর ভাবাবেগী মন।
বাঁশির শবদে মোর ভাঙলো রন্ধন॥
কোন সে বাজায় বাঁশি বাড়ি তার কই।
দাসী হয়ে তার পায়ে নিজে নত হই॥
কে বাজায় বাঁশি তার চিত্তের হরষে।
তার পায়ে পড়ি আমি কিবা কোন দোষে॥
অঝরে ঝরছে মোর নয়নের পানি।
বাঁশির শবদে আমি হারালাম প্রাণ-ই॥
(পুনর্লিখন: হাসানআল আব্দুল্লাহ)

লক্ষণীয়, চর্যার মতো এই কবিতাখণ্ডও পদ নির্ভর। ফলত, আদি ও মধ্যযুগের সিংহভাগ কবিতা রচিত হয়েছে গীত হওয়ার জন্যে। বাজনার তালে তালে গানের সুরে উপস্থিত শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করাই ছিলো ওইসব কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এর ছান্দিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী সময়ের অক্ষরবৃত্তের আট-ছয় এর চাল রয়েছে, কিন্তু কোথাও কোথাও দুর্বলতা ধরা পড়ে। এই দুর্বলতাও আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নয়, কারণ প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে স্বরের সংযোজন ও বিয়োজন (যোগ-বিয়োগ) ঘটানোর নিয়ম প্রচলিত ছিলো, যা চর্যাপদেও দেখা যায়, এখানে সেই নিয়ম কিছুটা হলেও বহাল রয়েছে। যেমন, "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিন্দী নইকূলে।" আট-ছয় চালে ভাঙলে দাঁড়ায়: "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি/ কালিন্দী নইকূলে।" সমস্যা দেখা দেয় "বড়ায়ি" ও "নইকূল" শব্দদ্বয়ে। কিন্তু প্রথম শব্দের 'ড়া' ও দ্বিতীয় শব্দের 'ই' হ্রাস করলে এই সমস্যা থাকে না। করা হয়েছেও তাই। অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে অক্ষরবৃত্তের যে নিয়ম অনুসরণ করা হয়, তার একটি হলো শব্দের প্রথম ও মাঝের বদ্ধস্বরকে একমাত্রা দেয়া, অর্থাৎ সেই নিয়মে 'নইকূল' পায় তিনমাত্রা। এটিও সম্ভবত প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত থেকে চলে আসা একটি নিয়ম যা আধুনিক ও উত্তরাধুনিক কালেও ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিয়োজন ঘটানোর প্রক্রিয়া শব্দকেই নতুন করে তুলেছে, যেমন, 'আইসু' হয়েছে 'আসু', 'পইসু' হয়েছে 'পসু' ইত্যাদি। মধ্যযুগের শুরুর দিক থেকেই শব্দের এই

বিবর্তন প্রতিয়মান হয়, ফলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুই প্রকার শব্দের ব্যবহারই একসাথে পাওয়া যায়।

৩

ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে আদি ও মধ্যযুগের সিংহভাগ কবিতাই গীত হওয়ার জন্যে রচিত। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে বেশ কয়েক শতাব্দী, প্রায় অর্ধসহস্রাব্দ ধরে, প্রাক মধুসূদনের কাল অর্থাৎ মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়-এর আবির্ভাব পর্যন্ত। অতএব পদাবলীর ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়নি। "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এবং পরবর্তী কবি রায়শেখর, কবিরঞ্জন প্রভৃতির রচিত সঙ্গীতসমূহ পদাবলী নামে অবিহিত হইয়া আসিয়াছে (শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)।" এই পর্যবেক্ষণেও স্পষ্ট যে পদাবলী আদতে গান; মূল শব্দটিও প্রত্যক্ষ ভাবে সঙ্কলিত হয়েছে 'পদ' থেকে; এর প্রথম ব্যবহার দেখা যায় জয়দেবের ক্ষেত্রে। তিনি তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতের নাম রেখেছিলেন পদাবলী। তবে, সঙ্গীত অর্থে পদের ব্যবহার বোধ করি তখনও নতুন কিছু ছিলো না; কারণ মহাকবি কালিদাসের কাল থেকে 'পদ' দিয়ে গানকেই বোঝানো হতো। অন্যদিকে পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি নামে পরিচিত। এটা ছিলো বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্ট কাব্যভাষা। "মিথিলার দেশীয় ভাষার মিশ্রণে আসাম, বাঙ্গালা, উড়িষ্যায় একই সময়ে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল (শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)।" মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার কবি চণ্ডীদাসের কাব্যের আদান-প্রদান হতো তখনকার শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে; যারা বাংলা থেকে মিথিলায় যেতেন শিক্ষা লাভের আশায় তারাই চণ্ডীদাসের লেখা সেখানে পৌঁছে দিতেন এবং ফেরার পথে বিদ্যাপতির পদ নিয়ে আসতেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তখনও কিন্তু 'বাংলা' শব্দটির প্রচলন বা এতদ অঞ্চলের মানুষের ভাষাকে 'বাংলা' হিসেবে ব্যবহার করা হতো না। "বস্তুত, সেকালের কবিরা এই ভাষাকে কেবল 'ভাষা,' 'দেশী ভাষা' অথবা 'লৌকিক ভাষা' বলে আখ্যায়িত করেছেন (গোলাম মুরশিদ)।" তবে যে নামেই একে চিহ্নিত করা হোক, এইভাষা যে আমাদের তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
...
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।

দু'টি ইয়োরোপীয় কবিতা পুরস্কার, হোমার মেডেল (২০১৬) ও ক্লেমেন্স জেনেস্কি আন্তর্জাতিক প্রাইজ (২০২১), প্রাপ্ত কবি হাসানআল আব্দুল্লাহ'র বিচরণ সাহিত্যের নানা শাখায়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৫২। বাংলা ছাড়াও অনূদিত হয়ে ইংরেজি, চাইনিজ ও পোলিশ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বই। তিনি সনেটের একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন, তাছাড়া মহাবিশ্বের চলমানতার বৈজ্ঞানিক সমীকরণের সাথে খেটে-খাওয়া মানুষের আর্ত-হাহাকারের যোগসূত্র স্থাপন করে লিখেছেন মহাকাব্য 'নক্ষত্র ও মানুষের প্রচ্ছদ' (অনন্যা, ২০০৭)। তাঁর 'কবিতার ছন্দ' (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭) ঢাকাসহ দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য-সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সম্পাদনা করেছেন 'বিশশতকের বাংলা কবিতা'(২০১৫), অনুবাদে প্রকাশ করেছেন 'বিশ্বকবিতা সংগ্রহ' (২০১৭) ও আমেরিকা থেকে 'কনটেম্পোরারি বাংলাদেশি পোয়েট্রি' (২০১৯)। লিখেছেন উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, ছড়া, গান ও ভ্রমণকাহিনি। দশের অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর কবিতা। আমন্ত্রিত হয়েছেন চীন, গ্রীস, পোল্যান্ড, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে। পেয়েছেন কুইন্স ব্যোরো প্রেসিডেন্টের সম্মাননা (২০০৭), লেবুভাই ফাউন্ডেশন পুরস্কার(২০১৩), কবির পঞ্চাশ উদযাপন কমিটির সম্মাননা স্মারক (২০১৭) ও নিউইয়র্ক কালচারাল এফেয়ার্স থেকে অনুবাদ গ্রান্ট (২০১৯)। তিনি নিউইয়র্ক শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র গণিত শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক কবিতা পত্রিকা 'শব্দগুচ্ছ' সম্পাদক।